নামায সংক্রান্ত মাসআলায়
আরব আলেমদের মাঝে
মতবিরোধ

ইজহারুল ইসলাম

সূচিপত্র

ভূমিকাঃ

ইসলামে দলাদলি, বিচ্ছিন্নতাবাদ ও পারস্পরিক শত্রুতা থেকে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে। অত্যন্ত দু:খের সঙ্গে বলতে হয়, ইসলামে ঐক্যের প্রতি যার পর নাই গুরুত্ব দেয়া সত্ত্বেও দিন দিন দলাদলি ও বিচ্ছিন্নতাবাদ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর মূলে রয়েছে ইসলামের বিরুদ্ধে অমুসলিমদের গভীর ষড়যন্ত্র, কিছু অপরিণামদর্শী, স্বার্থলোভী মানুষের অন্যায় হস্তক্ষেপ।

যে সমস্ত বিষয়ে ইসলামের মহা মনীষীগণ হাজারও পৃষ্ঠা রচনা করেছেন, যে বিষয়ের সমাধান ঐতিহাসিকভাবে গৃহীত হয়েছে, সেগুলোকে খুঁড়ে বের করে ফেতনার বিষ-বাষ্প ছড়িয়ে দেয়াটা এদের মূল উদ্দেশ্য। স্থিরকৃত বিষয়ে দুনিয়ার সকল আলেমের সিদ্ধান্তকে পায়ে দলে কিছু অপরিণামদর্শী নাম সর্বস্ব আলেমের বক্তব্যকে উপজীব্যকে মুসলমানদেরকে শতধা বিভক্ত করার চেষ্টা চলছে।

ভারত উপমহাদেশের মুসলমানগণ শুরু থেকেই ফিকহে হানাফীর অনুসরণ করে আসছে। সামান্য কিছু অঞ্চল ব্যতীত অধিকাংশ স্থানের মানুষ হানাফী মাযহাব অনুসরণ করে ধর্মীয় ক্ষেত্রে নিজেদের ঐক্য ও সম্প্রীতি অটুট করে রেখেছে। ইংরেজদের আগমণের পূর্বে তাদের এ ঐক্যে কোন ফাটল ধরেনি। ইংরেজরা ভারত উপমহাদেশে মুসলমানদেরকে প্রধান শত্রু হিসেবে বিবেচনা করতে থাকে। এবং প্রকৃত পক্ষে অন্যান্য সকল জাতি ইংরেজদের প্রতি সমর্থন জানালেও একমাত্র মুসলমানরাই মাথা নত করতে অস্বীকৃতি জানায়। এক্ষেত্রে ইংরেজরা মুসলমানদের শক্তি খর্ব করার উদ্দেশ্যে কয়েক ধরণের ফেতনার জন্ম দেয়। হাদীস অস্বীকারকারীদের ফেতনা, ইসলামকে মডার্নাইজেশনের ফেতনা, ক্বাদিয়ীনী ও আহলে হাদীস ফেতনা এগুলোর অন্যতম। এটি একটি ঐতিহাসিক সত্য যে, ভারত উপমহাদেশে আহলে হাদীসদের জন্ম হয়েছে দ্বীনি মহলে মুসলমানদের নিজেদের কোন্দলকে তুঙ্গে

উঠানোর জন্য। হক্বপন্থী উলামায়ে কেরামের বিরোধীতা, তাদের সঙ্গে বেয়াদবি, সত্য বিষয়কে মিথ্যার আবরণে আবৃত করাই এদের মূল লক্ষ্য। এদের মূল শ্লোগান হাদীস অনুসরণ করা হলেও বাস্তবিক পক্ষে এরা হাদীসের অনুসরণ থেকে সবচেয়ে বেশি বিচ্ছিন্নতা অবলম্বনকারী। দু'শ বছরের অধিক সময় ধরে এরা হক্বের বিরোধীতা করে আসছে। অন্যায়ের মোকাবেলায় কোথাও এদেরকে দেখা যায় না, বাতিল প্রতিরোধে এরা সুকৌশলে নিরবতা অবলম্বন করে থাকে। কিন্তু হক্বের বিরুদ্ধে সোচ্চার হিসেবে যদি কোন দলের দৃষ্টান্ত খোঁজেন, তবে সর্বাগ্রে এদেরকে খুঁজে পাওয়া যাবে।
কোথাও মুহাম্মাদী, কোথাও ওহাবী, কোথাও গাইরে মুকাল্লিদ ও আহলে হাদীস হিসেবে নিজেদেরকে পরিচয় দিয়ে থাকে। সমগ্র মুসলমানদেরকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার কথা বললেও এরা নিজেরা কখনও ঐক্যবদ্ধ হতে পারেনি। নিজেদের মধ্যে একের পর এক নতুন গ্রুপ তৈরি করে চলেছে। বর্তমানে আমাদের দেশে যে সমস্ত আহলে হাদীসদের আস্ফালন দেখা যায়, তারাও বিভিন্ন গ্রুপে বিভক্ত। শুধু দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রেই নয়, বরং রীতিমতো একদল আরেকদলকে গোমরাহ, তাকফীরি ইত্যাদি আখ্যায়িত করে থাকে। উস্তাদ যখন বেয়াদবি শিক্ষা দেয়, তখন ঐ উস্তাদ সর্বপ্রথম ছাত্রের কাছে লাঞ্ছিত হয়। ফলে, এরা যখন অন্যকে বেয়াদবি শিক্ষা দেয়, সেই ছাত্রের হাতেই আবার লাঞ্ছিত হওয়া স্বাভাবিক। পূর্ব যুগের বড় বড় ইমামদের প্রতি চরম বিদ্বেষ সৃষ্টির মাধ্যমে এদের শিক্ষার হাতে-খড়ি। এদের সমগ্র কার্যক্রমের মূল কেন্দ্রবিন্দু হলো, সত্যের বিরোধীতা করে মুসলমানদেরকে শতধা বিভক্ত করা।

সাধারণ মুসলমানদেরকে যদি বৃহত্তর মুসলিম সমাজের প্রতি চরম বিদ্বেষী করে তুলা যায়, তবে খুব সহজে ইসলামের মূলে চূড়ান্ত আঘাতটি হানা সম্ভব হবে। ইসলামের ইতিহাস সম্পর্কে যাদের ন্যুনতম ধারণা আছে, তারা নিশ্চিতরূপে অবগত আছেন যে, খাইরুল কুরুনের পর থেকে অদ্যাবধি মানুষ

চার মাযহাব কেন্দ্রিক তাদের মাসআলা-মাসাইলের উপর আমল করে থাকে। এবং বার -তের শ’ বছরের ইতিহাসে প্রত্যেক যুগের উলামায়ে কেরাম ও সাধারণ মুসলমান এ চার মাযহাবের কোন একটি অনুসরণ করে আসছে। লক্ষ-লক্ষ মুহাদ্দিস, ফকীহ, মুফাসসির ও ঐতিহাসিক ও তাদের অনুসারীরা এ চার মাযহাবের অনুসরণ করে সত্যের উপর অবিচল থেকেছেন। একমাত্র শিয়’া এবং আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত বহির্ভূত হাতে গোনা কয়েকজন যাহেরী ব্যতীত ইসলামের ইতিহাসে চার মাযহাবের বিরোধীতা করেছে এমন কারও অস্তিত্ব পাওয়া যায় না। অথচ শিয়া ও ক্বাদিয়ানী ফেতনার সমন্বয়ে গঠিত বর্তমান সময়ের লামাযহাবী-আহলে হাদীসরা মাযহাবের বিরোধীতাকে নিজেদের জীবনের মূল টার্গেট বানিয়েছে। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ইহুদী-খ্রিষ্টানদের অর্থায়নে পরিচালিত এ ফেতনাটি কিভাবে সমগ্র মুসলিম উম্মাহকে কাফের মুশরিক আখ্যায়িত করে থাকে তার কিছু নমুনা দেখুন,

১. লা-মায্হাবীদের বহুল আলোচিত বই “ কাটহুজ্জাতীর জাওয়াব ” বইয়ের লিখক মাওঃ আবু তাহের বর্দ্ধমানী লিখেছেঃ

“ তাক্বলীদ হচ্ছে ঈমানদারদের জন্য শয়তানের সৃষ্ট বিভ্রান্তি। ”

(কাটহুজ্জাতীর জাওয়াবঃ পৃ - ৮৩)

২. অত্যন্ত বিতর্কিত বই “তাওহীদী এটম বোম ” বইয়ের প্রণেতা মাওঃ আব্দুল মান্নান সিরাজনগরী (বগুড়া) লিখেনঃ

“ মুক্বাল্লিদগণকে মুসলমান মনে করা উচিত নয় । ”

(তাওহীদী এটম বোমঃ পৃ - ১৫)

৩. রংপুর শোলবাড়ী নিবাসী মোঃ আব্দুল কাদের লিখেনঃ

“মায্‌হাবীগণ ইসলাম থেকে বহিষ্কৃত, তাদের মধ্যে ইসলামের কোন অংশ নেই

(তান্বিহুল গাফেলীন, আব্দুল কাদির রচিতঃ পৃ.৭)

৪. “ই’তেছামুস সুন্নাহ” গ্রন্থের রচয়িতা মাওঃ আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদী লিখেঃ “চার ইমামের মুক্বাল্লেদ এবং চার তরিকার অনুসারীগণ মুশরিক ও কাফির।” (ইতেছামুস্ সুন্নাহ্ঃ পৃঃ ৭-৮) এভাবে জফরুল মুবিন প্রণেতা মৌঃ মুহিউদ্দীন, তরজমানে ওহ্‌হাবিয়্যাহ প্রণেতা নবাব ছিদ্দীক হাসান খান এবং লা-মায্‌হাবীদের সর্বশ্রেষ্ঠ ফাতওয়ার কিতাব ফতোয়ায়ে নাজিরিয়ার সংকলক মৌঃ নাজিমুদ্দীন প্রমুখ মায্‌হাব-অবলম্বীদেরকে কাফির, মুশরিক, বি’দআ’তী ও জাহান্নামী বলে ফতোয়া দিয়েছে। (দ্রঃ জফরুল মুবিনঃ পৃঃ ১৮৯-২৩০-২২৩; তরজমানে ওহ্‌হাবিয়্যাহঃ পৃঃ ৩৫-৩৬; ফতোয়ায়ে নাযীরিয়াঃ পৃঃ ১/৬৯-৯৭)

এটি হলো, তথাকথিত আহলে হাদীসদের স্বরূপ। এরা মুসলমানদেরকে পরস্পরের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেয়ার যে গভীর ষড়যন্ত্র করেছে, তার মূল এজেন্ডা বাস্তবায়নে এরা কয়েকটি মাসআলাকে মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেছে। এই মাসআলা গুলোতে প্রতিপক্ষের অবস্থান শক্তিশালী হওয়া সত্ত্বেও ইলমী খিয়ানত, মিথ্যা অপবাদ, জালিয়াতি ইত্যাদিকে আশ্রয় করে তারা সমাজে প্রপাগান্ডা চালিয়ে থাকে। যেমন, ধরুন, এরা কোন বে নামাযীকে বলে না যে, আপনি নামায পড়ুন। কিন্তু কেউ যদি তাবলীগ বা অন্য কোনভাবে নামাযের প্রতি উদ্বুদ্ধ হয়ে মসজিদে

আসে, তখন এরা তাকে বলবে, ভাই তোমার নামায হয় না। কেননা, তুমি তো নামাযে সূরা ফাতিহা পড়ো না, ইত্যাদি ইত্যাদি। এভাবে তার মাঝে সংশয় সৃষ্টি করে মসজিদ বিমুখ করার পায়তারা করতে থাকে। অথচ এসমস্ত মাসআলায় ইসলামের শুরু থেকেই মতবিরোধ রয়েছে এবং উভয় পক্ষের শক্তিশালী দলিল রয়েছে এবং প্রত্যেকেই দলিল অনুযায়ী আমলের চেষ্টা করছে।

ইংরেজদের সময়ে ফেতনাবাজ এই আহলে হাদীসদের ক্বেবলা ইংরেজরা থাকলেও এখন তারা তাদের ক্বেবলা পরিবর্তন করেছে এবং আরব সালাফীদেরকে তাদের নতুন ক্বেবলা বানিয়েছে। সাধারণ মুসলমানদেরকে এই বলে ধোঁকা দেয়ার চেষ্টা করে থাকে, সউদী আরবের অমুক আলেম এটা বলেছেন, অমুক আলেম ওটা বলেছেন। মক্কা-মদিনার প্রতি মুসলমানদের সহজাত দূর্বলতা থাকায় এবং বর্তমান সময়ের সালাফীদের প্রকৃত অবস্থা না জানা থাকায় সাধারণ মানুষ ধোঁকায় পড়ে যান। সউদী আরবের বিভিন্ন ভার্সিটি থেকে পাস করা কিছু অপরিণামদর্শীকে অর্থের বিনিময়ে তাদের এই এজেন্ডা প্রচারে নিয়োগ দিয়েছে। বিভিন্ন টি.ভি চ্যানেলে বর্তমান সউদী সউদী বলে সাধারণ মানুষকে ধোঁকা দেয়ার চেষ্টা করছে। বিশেষ করে এরা আলবানী সাহেবকে নিয়ে খুব মাতামাতি করে থাকে।

আলবানী সাহেবের প্রকৃত বাস্তবতা ‘মাযহাব প্রসঙ্গে ডা.জাকির নায়েক একটি গবেষণামূলক পর্যালোচনা’ বইয়ে আলোচনা করেছি। খুব শীঘ্রই আরও ব্যাপকভাবে আলবানী সাহেবের ইলমী খিয়ানত, হাদীস নিয়ে তামাশা ও উলামায়ে কেরামের প্রতি চরম বিদ্বেষের বাস্তব চিত্র তুলে ধরে একটি সঙ্কলন প্রকাশ করব ইনশাআল্লাহ।

এ পুস্তকের মূল উদ্দেশ্যঃ

এই সংক্ষিপ্ত পুস্তকে নামায সংক্রান্ত চল্লিশটি মাসআলা সঙ্কলন করা হয়েছে, যাতে বর্তমান সময়ের সালাফী তিন ইমাম আব্দুল্লাহ বিন বায, সালেহ আল-উসাইমিন ও আলবানী সাহেবের মাযহাব উল্লেখ করা হয়েছে। বাংলাভাষী হানাফী মাযহাবের অনুসারী কেউ উক্ত মতানৈক্যপূর্ণ মাসআলার উপর আমল করবে সেজন্য এগুলো সঙ্কলন করা হয়নি। মনে রাখার দরকার, সাধারণ কোন মুসলমানের জন্য আলেমদের অনুমতি ব্যতীত বিরোধপূর্ণ মাসআলায় নিজস্ব মতানুযায়ী আমল করার অনুমতি নেই। সুতরাং হানাফী মাযহাবের অনুসারীগণ প্রচলিত সুন্নাহ সম্মত পদ্ধতি অনুযায়ী নামায আদায় করবেন।

এই বিরোধপূর্ণ মাসআলা আলোচনার মূল উদ্দেশ্য হলো-

- সালাফী, সউদী বা আরব আলেমদের নামে যে মিথ্যা প্রপাগান্ডা ছড়িয়ে আমাদের দেশের তথাকথিত আহলে হাদীসরা তাদের হীন স্বার্থ হাসিলের চেষ্টা করে থাকে, তার মুখোশ উন্মোচন করা।
- চার মাযহাবকে মুসলমানদের অনৈক্যের কারণ চিহ্নিত করে যারা এক মাযহাবের অনুসারী হওয়ার দাওয়াত দিয়ে থাকে, এ পুস্তিকাটি তাদের এ বিকৃত চেতনার সমুচিৎ জবাব হিসেবে কাজ করবে বলে আশা রাখি। কেননা, চার মাযহাব ছেড়ে মুসলমানদের যদি এক মাযহাবে তথা আহলে হাদীস হওয়া সম্ভব হতো, তবে বর্তমান সময়ে সালাফীদের তিন ইমামের মাঝে আক্বিদা থেকে শুরু করে অসংখ্য মাসআলায় মতবিরোধ দেখা দিতো না।
- বিভিন্ন মাসআলায় মতবিরোধের কারণে যারা মাযহাব অনুসারীদেরকে হাদীস বিরোধী হিসেবে অপপ্রচার চালিয়ে থাকে, তাদের এ অপপ্রচারের বাস্তব সম্মত উত্তর হবে। কেননা, তোমাদের এ তিন ইমাম হাদীসের

অনুসারী হওয়া সত্ত্বেও যখন অসংখ্য মাসআলায় মতবিরোধ করছে, তখন হানাফীদের বিরুদ্ধে এতো বিষদগার কেন?

- শাখাগত মাসআলা-মাসাইলে দলিল ভিত্তিক মতবিরোধ হওয়া একটি সর্বজন স্বীকৃত ও স্বত:সিদ্ধ বিষয়। সাহাবায়ে কেরামের যুগ থেকে অদ্যাবধি এসমস্ত বিষয়ে মতানৈক্য হয়ে আসছে। এই তিন ইমাম কেন, পৃথিবীর তাবৎ ইমামগণের ইলম একত্র করলেও একজন সাহাবীর ইলমের তুলনায় তা তুচ্ছ। সাহাবীদের মাঝে যখন মতানৈক্য হয়েছে, তখন বর্তমান সময়ের আহলে হাদীসরা এমন কোন ইলমের সন্ধান পেয়েছে যার মাধ্যমে তারা নিমিষেই সকল মতবিরোধকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার দাবী করছে। এ পুস্তকের মাধ্যমে তাদের এ মিথ্যা দাবীর স্বরূপ উন্মোচিত হবে।
- যারা এই দাবী করে থাকে যে, একই সাথে চার মাযহাব কিভাবে বিশুদ্ধ হয়? তাদের সামনে বড় চ্যালেঞ্জ থাকবে যে, একই সাথে আপনাদের তিন ইমামের বক্তব্য কিভাবে সঠিক হয়? এ তিন ইমামের যাকেই ভুল সাব্যস্ত করবেন, সেই হাদীস বিরোধী হিসেবে বিবেচিত হবে। কেননা, এ তিন ইমামের প্রত্যেকেই দলিল হিসেবে হাদীস উল্লেখ করেছেন।
- বর্তমান সালাফী মাযহাব গ্রহণ আমাদের দেশে যেসমস্ত আলেম মাদানী নাম ধারণ করে বিভিন্ন টি.ভি চ্যানেলে বক্তৃতা করে সাধারণ মানুষকে ধোঁকা দিচ্ছে তাদের মুখোশ উন্মোতি হবে। যেই মাসআলায় তারা হানাফীদের বিরোধীতা করছে, দেখা যাবে যে, হানাফীদের অনুরূপ বক্তব্য তাদের তিন ইমামের কোন একজন দিয়েছে। প্রথমত: তারা আরব সালাফীদের সঠিক তথ্য মানুষের সম্মুখে উল্লেখ করে না। দ্বিতীয়ত: হানাফী মাযহাবের সুন্নাহ সম্মত পদ্ধতিকে ভ্রান্ত বলে উল্লেখ করে তাদের উস্তাদদের পথ থেকে নিজেরা যেমন বিচ্যুত হয়েছে, তেমনি সাধারণ মানুষকে বিচ্যুত করছে।
- আলবানী সাহেবের অসংখ্য ইলমী খিয়ানতের কারণে তিনি আমাদের আলোচনায় মৌলিক কোন গুরুত্ব রাখেন না। তবে, এখানে একটি কথা উল্লেখ করা সমীচিন মনে করছি। আমাদের দেশের আহলে হাদীসরা তার

সিফাতুস সালাহকে তাদের দলিল হিসেবে নিয়েছে। এবং একে নিয়ে খুব মাতামাতি করে থাকে। আলবানী সাহেবের সবচেয়ে বড় ভ্রান্তি হলো, এ কিতাবে তিনি এটা প্রচার করার চেষ্টা করেছেন যে, তার কিতাবে বর্ণিত পদ্ধতিই একমাত্র রাসূল স. এর নামাযের পদ্ধতি। এ কিতাব অনুযায়ী নামায পড়লে কেমন যেন সরাসরি রাসূল স.কে দেখে নামায পড়া হলো। তার বর্ণিত পদ্ধতি ব্যতীত আর যতো পদ্ধতি আছে সব হাদীস বিরোধী। আলবানী সাহেবের এ ভ্রান্তি উন্মোচনের জন্য এ পুস্তকের ৪০ টি মাসআলায় যথেষ্ট। প্রচূর ইলমী খিয়ানত, মুসলিম উম্মাহ থেকে বিচ্ছিন্নতা, সহীহ হাদীসকে যয়ীফ বলা এবং যয়ীফকে সহীহ বলা, এবং সাহাবাদের যুগ থেকে অদ্যাবধি যে বিষয়গুলো নামাযের সুন্নাহের অন্তর্ভূক্ত ছিল না, সেগুলোকে সুন্নাহ হিসেবে চালিয়ে দেয়ার মতো মারাত্মক অন্যায়গুলো আলবানী সাহেব তার সিফাতুস সালাহ নামক বইয়ে করেছেন।

আলবানীর অনুসারী তথাকথিত আহলে হাদীসদেরকে বলবো, আপনারা যদি প্রকৃত সত্যান্বেষী হতেন, তবে আপনারা আলবানী সাহেবের এসমস্ত ভ্রান্তিকে মানুষের সামনে গোপন রেখে তার মতবাদ প্রচারে লিপ্ত হতেন না। এ পুস্তকের মাধ্যমে এ বিষয়টিও পাঠকের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, চার মাযহাবের অনুসৃত পদ্ধতি সুন্নাহ সম্মত পদ্ধতি। সমগ্র উলামায়ে কেরামের বিরোধীতা করে কেউ যদি এককভাবে নিজের বুঝকে চূড়ান্ত ঘোষণা করে, তবে উলামায়ে কেরামের বিরোধীতাই তার ভ্রান্ত হওয়ার জন্য যথেষ্ট।

সাধারণ মানুষদেরকে একটা অনুরোধ করবো, আপনি যে মাযহাব অনুসরণ করছেন, সেটি সম্পূর্ণ হাদীস মোতাবেক সুন্নাহসম্মত। কোন বিষয় বুঝে না এলে উলামায়ে কেরামের সঙ্গে আলোচনা করে বুঝে নিন। ফেতনা সৃষ্টিকারী তথাকথি আহলে হাদীস ও মাদানী-সালাফিদের কথায় বিভ্রান্ত হবেন না। কেননা, ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলোতে এদের কাছে নতুন কোন ওহী আসেনি, যার মাধ্যমে তারা নতুন নতুন থিউরী আবিষ্কার করবে।

এ পুস্তকে মাত্র চল্লিশটি মাসআলা সঙ্কলন করা হয়েছে। মূলত অসংখ্য মাসআলায় এই তিন ইমামের মাঝে মতবিরোধ হয়েছে। বর্তমান সময়ে ড. সায়াদ বিন আব্দুল্লাহ আল-বারীক "আল-ই'জায ফি বা'যি মাখতালাফা ফিহিল আলবানী ও ইবনে উসাইমিন ও ইবনে বায"। এ কিতাবে তিনি এই তিন ইমামের মাঝে মতনৈক্যপূর্ণ মাসআলাগুলো বিস্তারিত দলিলসহ আলোচনা করা হয়েছে। আগ্রহী পাঠকগণ এটি সংগ্রহে রাখতে পারেন।

ধর্মীয় ক্ষেত্রে নিজের অবস্থান বুঝুন, অল্প বিদ্যা ভয়ঙ্কর থেকে বাঁচুন:

অনেকের মুখে শোনা যায়, "আমরা মাযহাব মানি না, কুরআন ও হাদীস মানি" এ কথা বলার দ্বারা উদ্দেশ্য কী? মাযহাব সমূহে কি কোরআন ও হাদীসের কোন কথা নেই? দীর্ঘ বার-তের শ' বছর যাবৎ মুসলিম উম্মাহ কি কুরআন ও হাদীস মানেনি? না কি এদের উপর নতুন কোন কুরআন ও হাদীস অবতীর্ণ হয়েছে?

ইসলামী আইন বিশারদগণ যে সমস্ত কিতাব লিখে গিয়েছেন, তারা সেগুলোতে কী আলোচনা করেছেন? তাদের আলোচ্য বিষয় কী? তাদের উদ্দেশ্য কী?

কেউ যদি ইসলামে "ফেকাহ" কাকে বলে এবং ফিকহের আলোচ্য বিষয় ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে সামান্য থেকে সামান্যতম জ্ঞান রাখে, তবে অন্ততঃ তার মুখ থেকে এ ধরণের নির্বুদ্ধিতা ও হাস্যকর বিষয় আশা করা যায় না। ইমামগণ আমাদের সামনে কুরআন ও হাদীসের জটিল ও দুর্বোধ্য বিষয়গুলির সমাধান দিয়েছেন। তারা শুধু কুরআন ও সুন্নাহেরই ব্যাখ্যা করেছেন।

ইসলামের ফকীহগণ কি তাদের ফিকাহের কিতাব সমূহে 'গল্প-উপাখ্যান এবং কবিতা ইত্যাদি রচনা করছেন? না কি তারা তাদের কিতাবে কোন রাজা

বাদশাহর গুণ গেয়েছেন? তাদের কিতাবে কি তারা নিজেদের বংশীয় স্তুতি গেয়েছেন?

তারা ফেকাহের কিতাবসমূহে কী আলোচনা করেছেন? তাদের আলোচ্য বিষয় কি 'উদ্ভট সব ভূত-প্রেতের গল্প? না কি দেবতাদের উদ্ভট সব কল্পকাহিনী?

এখন কেউ যদি বলে, আমি সাইন্সে বিশ্বাস করি কিন্তু আইনস্টাইন আর নিউটনের বা অপরাপর বিজ্ঞানীদের কোন তথ্যই আমার নিকট গ্রহণযোগ্য না, তাহলে সে কোন বিজ্ঞানে বিশ্বাসী? অথচ বিজ্ঞান বলতেই আইনস্টাইন বা নিউটন নয়। আবার নিউটন বলতেই বিজ্ঞান নয়। আবার এরা ছাড়াও বিজ্ঞান নয়। তাহলে বিজ্ঞান বুঝতে বড় বড় সাইন্টিস্টদের বের কথা তথ্য, তাদের লিখিত ও প্রমাণিত তথ্য সমূহে যদি কোন ছাত্রের আস্থা না থাকে, অথচ তার দাবী হল আমি বিজ্ঞানে বিশ্বাসী। এধরণের ব্যক্তিকে কি বিজ্ঞানে বিশ্বাসী বলা যায়?

তেমনিভাবে কোন ডাক্তার যদি মনে করেন, আমি ডাক্তার হব ঠিকই, কিন্তু ডাক্তারি বিষয়ক কোন বইপত্র পড়তে রাজি না, জগৎ বিখ্যাত ডাক্তারদের প্রমাণিত অভিমতও আমার নিকট গ্রহণযোগ্য নয়, কোন অভিজ্ঞ ডাক্তারের অধীনে ইন্টার্নি করতে রাজি নই, তবে আদৌ কি তিনি ডাক্তার হতে পারতেন?

সত্য কথা হল, আমরা জাগতিক বিষয়ে খুব ভাল বুঝি, কিন্তু যখনই ধর্মীয় কোন বিষয় আসে সাথে সাথে স্বশিক্ষিত হওয়ার দাবী করি।

বর্তমান সমাজে কুরআন ও হাদীসে সামান্যতম কোন জ্ঞান রাখে না, ধর্মের মৌলিক বিষয়ে যাদের জ্ঞান শূন্যের কোঠায়, তারা দাবি করে, আমরা কেন ইমাম মানতে যাব? আমরা কেন মাযহাব মানতে যাব? অথচ ইসলামী আইন শাস্ত্র (ফেকাহ) কী এবং ফেকাহের খুঁটি নাটি বিষয় তো দূরে থাক, এরা বলতে গেলে "ফেকাহের" ফ'টাও জানে না।

এখন কেউ যদি কোন বিষয় না জানে এবং একথা অস্বীকার করে বলে যে, “আমি জানি” তবে তাকে বোঝাতে সক্ষম হবে এমন কেউ আছে বলে মনে হয় না। এদেরকে আরবীতে বলে, জাহেলে মুরাক্কাব, অর্থাৎ সে এমন অজ্ঞ যে, নিজেও জানে না যে, আমি অজ্ঞ।

বাস্তবতা হল, প্রতিটি বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করতে গেলে তার মৌলিক বিষয়গুলি অবশ্যই জানতে হয়। একথা যেমন জাগতিক কোন বিষয়ের ক্ষেত্রে সত্য, তেমনি ধর্মীয় বিষয়ের ক্ষেত্রেও সত্য। কিন্তু ধর্মীয় বিষয়ে অনেকেই তা মানতে রাজি নন। কোন ব্যক্তি যেমন সাইন্সের উপর লেখা একটি বই পড়ে কিংবা কোন সাইন্টিস্টের লেকচার শুনে সাইন্টিস্ট হয়ে যায় না বরং সাইন্সের মৌলিক জ্ঞান অর্জনের পাশাপাশি সঠিক পদ্ধতিতে অধ্যবসায় আবশ্যক, তেমনি ধর্মীয় বিষয়ে দু'একটি বই পড়লে সে মুজতাহিদ হয়ে যায় না।

কেউ যদি অভিবাবকদেরকে প্রশ্ন করে- আপনাদের ছেলে মেয়েদেরকে আপনারা প্লে, নার্সারি, ক্লাস ওয়ানে......দেন কেন? শুরুতেই কেন মাস্টার্সের বইগুলো পড়তে দেন না। তাহলে তো সময়ও যেমন বেঁচে যেত, তেমনি একটি সঠিক ও লেটেস্ট বিষয়ে পূর্ণ জ্ঞান অর্জিত হয়ে যেত। তাড়াতাড়ি শিক্ষিত হতে পারত। কেন শুধু শুধু তাদের জীবনের দীর্ঘ সময় পড়া-লেখা করে জীবনের মূল্যবান সময়টা নষ্ট করান?

অভিবাবকগণ তাকে কী বলবে? হয়ত বলবে, পাগল না কি! শুরুতেই মাস্টার্সের বই দিলে বাচ্চারা কিছু বুঝবে! তাদের ব্যাসিক শিখতে হবে, ব্যাসিক মজবুত না হলে, ভাল শিক্ষিত হতে পারবে না। এই সাধারণ বিষয়টা বুঝলে না?!

এই ব্যাসিকের কথাগুলো যদি ধর্মীয় কোন বিষয়ের ক্ষেত্রে বলা হয়? তখন হয়ত অনেকেই বলবেন, আমরা যথেষ্ঠ জানি, আমি বোখারীর অনুবাদ পড়ি। অনেকে হয়ত বলবেন, আমার কুরআন শরীফের ইংরেজী অনুবাদ মুখস্থ...আমি অমুক স্কোলারের লেকচার নিয়মিত শুনে থাকি, অমুক

টেলিভিশনের প্রোগ্রাম দেখি, অমুক অমুকের টকশোর আলোচনা নিয়মিত শুনি ইত্যাদি ইত্যাদি।

এধরণের যুক্তি কেউ যদি উপস্থাপন করেন, তবে আমাদের কিছু বলার নেই। তবে তাদেরকে এতটুকু বলা যাবে যে, দেখুন! আপনাদের ছেলে-মেয়েদের ক্ষেত্রেও এ কথাটি বাস্তবায়ন করুন। টেলিভিশনে বিজ্ঞানের বিষয়ে প্রতিদিন হাজারও প্রোগ্রাম হচ্ছে। এরকম দু'একটি প্রোগ্রাম দেখিয়ে তাদের বিজ্ঞান শিক্ষাকে যথেষ্ঠ মনে করা উচিৎ। বিভিন্ন সেমিনারে পৃথিবীর সব বিষয়ে প্রতিনিয়ত লেকচার চলছে, ইন্টারনেটে সার্চ দিলে তথ্যের মহাসমুদ্র পাওয়া যাবে, হাতের নাগালে এতকিছু থাকা সত্ত্বেও লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে কেন ছেলে- মেয়েদেরকে স্কুল-কলেজ ও ভার্সিটিতে ভর্তি করান? তাদের জন্য এরকম দু' একটি লেকচার যথেষ্ঠ মনে করা হয় না কেন? অথচ ধর্মীয় বিষয়ে জ্ঞানের জন্য আমরা কোন স্কোলারের লেকচারই যথেষ্ঠ মনে করছি। টকশোর আলোচনা এখন আমাদের নিকট গ্রহণ যোগ্য উৎসে পরিণত হয়েছে।

বাকী রইল, কুরআনের অনুবাদ পড়া আর বুখারী পড়ার বিষয়টি। এ সম্পর্কে সচেতন পাঠক মাত্রই অবগত আছেন যে, পৃথিবীতে ডাক্তারি বইয়ের কোন অভাব নেই। ইঞ্জিয়ারিং বিষয়ের বইয়েরও অভাব নেই।

এখন কেউ যদি একটা ডাক্তারি বই পড়ে নিজেকে ডাক্তার মনে করে এবং এটি তার জন্য যথেষ্ঠ হয়ে যায়, তাহলে পৃথিবীর অলিতে-গলিতে ডাক্তার পাওয়া যাবে। এবং সামান্য পড়া-লেখা জানা ব্যক্তিরাও ডাক্তার হয়ে যাবে। তবে ডাক্তারি পড়ার জন্য সারা পৃথিবীতে এত প্রতিযোগিতা কেন? বই পড়ে জ্ঞান অর্জন, কোন স্কোলারের লেকচার, রেডিও-টেলিভিশনের কোন প্রোগ্রাম যদি কোন শিক্ষার জন্যই মৌলিকভাবে যথেষ্ঠ হত, তাহলে পৃথিবীতে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থাকত না।

এ বিষয়টা একজন মূর্খ থেকে মূর্খ লোকও স্বীকার করতে বাধ্য। কিন্তু যখনই ধর্মীয় বিষয় আসে, তখন কেউ স্বীকার করতে রাজি নই যে, ধর্মীয় বিষয়ে মৌলিক জ্ঞান জরুরি, ধর্মীয় বিষয়ে একাডেমিক শিক্ষা জরুরি। একজন

ডাক্তার যেমন একাডেমিক শিক্ষা ব্যাতীত ডাক্তার হওয়ার যোগ্য হয়ে যান না, একজন ইঞ্জিয়ার যেমন একাডেমিক শিক্ষা ব্যতীত ইঞ্জিয়ার হতে পারেন না, একই কথা ধর্মীয় বিষয়ের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

সতুরাং প্রত্যেকের জন্য নিজেদের প্রতি একটু রহম করা উচিৎ! উম্মতে মুসলিমার প্রতি একটু রহম করা উচিৎ। একজন ডাক্তার যেমন কোন আর্কিটেক্টের ডিজাইনের ভুল ধরার পিছে পড়েন না, আবার একজন ডাক্তার যেমন একজন ইঞ্জিয়ারের ভুল ধরতে যান না, সেভাবে প্রত্যেক জ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এখন যদি সে তার জ্ঞানের সীমা-রেখা অতিক্রম করে, তবে সে যে নির্বুদ্ধিতায় লিপ্ত তাতে কোন সন্দেহ থাকে না।

এ আলোচনা দ্বারা কেউ ভুল বুঝবেন না যে, আমরা ধর্মীয় বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করতে মানুষকে নিরুৎসাহিত করছি। নাউযুবিল্লাহ! আমাদের উদ্দেশ্য হল, দ্বীনের বিষয়ে জ্ঞান অর্জনের অধিকার সকলেরই রয়েছে। কিন্তু কোন বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করা আর সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত দেওয়া এক জিনিস নয়। ডাক্তারি বই-পত্র পড়ে এ বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করা যেতে পারে, তবে বই-পত্র পড়ে যে প্রিসক্রিপশন দেওয়া যাবে না একথা সবাই স্বীকার করে থাকেন। দ্বীনের ক্ষেত্রেও জ্ঞান অর্জন সকলেই করবে, কিন্তু এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত দেয়ার অধিকার সকলের জন্যই স্বীকৃত নয়।

সুতরাং ধর্মীয় ক্ষেত্রে দু'একটি হাদীসের বই কিংবা অনুবাদ পড়ে কেউ নিজেকে পন্ডিত মনে করবেন না বলেই আশা রাখি। ধর্মীয় ক্ষেত্রে আপনি কতটুকু জানেন, সে সম্পর্কে সচেতন হোন। আলেমদের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ বজায় রেখে তাদের পরামর্শ গ্রহণ করুন। স্বশিক্ষিত হওয়াটা শুধু আপনার অশুভ পরিণতি বয়ে আনবে না, বরং অনেক মানুষের ভ্রষ্টতার কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

মাসআলা-১

ওযুতে বিসমিল্লাহ পড়ার বিধান

প্রথম বক্তব্য: ওযুর শুরুতে বিসমিল্লাহ পড়া ওয়াজিব। এটি ইবনে বায[১] ও আলবানী [২] সাহেবের বক্তব্য।

দ্বিতীয় বক্তব্য: ওযুর শুরুতে বিসমিল্লাহ পড়া সুন্নত। এটি ইবনে উসাইমিন রহ. এর বক্তব্য।[৩]

মাসআল-২

ওযুতে ধারাবাহিকতা রক্ষার বিধান

প্রথম বক্তব্য: ওযুতে অঙ্গসমূহ ধারাবাহিকভাবে একের পর এক ধৌত করা ওয়াজিব। এটি ইবনে বায[৪] ও ইবনে উসাইমিন[৫] রহ. এর বক্তব্য।

দ্বিতীয় বক্তব্য: ওযুতে ধারাবাহিকতা রক্ষা করা ওয়াজিব নয়। এটি আলবানী সাহেবের অভিমত।[৬]

---

[১] মাজমুউ ফাতাওয়া ও মাকালাত, খ.১০, পৃ.২৮,৩২,৯৮,১০০। ফাতাওয়া নুরুন আলাদ দারব, খ.২, পৃ.৬০৩-৬০৫। আল-ফাওয়াইদুল জালিয়্যা, পৃ.৫২।

[২] তামামুল মিন্না, পৃ.৮৯। সিলসিলাতুল আহাদিসিস যয়ীফা, খ.১৩,পৃ.৮২৬। ফাতাওয়াশ শায়খ আলবানী ফিল মাদীনাতি ওয়াল ইমারাত, পৃ.৭০।

[৩] আশ শরহুল মুমতা, খ.১, পৃ.১৮১,১৮৩,২৩৪।

[৪] মাজমুউ ফাতাওয়া ও মাকালাত, খ.৩, পৃ.২৯৪। খ.১০, পৃ.১০২,১০৬। আল-ফাওয়াইদুল জালিয়্যা, পৃ.৫২।

[৫] আশ শরহুল মুমতা, খ.১, পৃ.২১৭-২১৮। মাজমুউ ফাতাওয়া ও রসাইল, খ.১১, পৃ.১৪১-১৪৪।

[৬] সিলসিলাতুল আহাদিসিস সহীহা, ১/১/৫২৫। হাদীস নং ২৬১। তামামুল মিন্না,পৃ.৮৮।

মাসআলা-৩

ওযুতে একবারের অধিক মাথা মাসেহ করার বিধান

প্রথম বক্তব্যঃ ওযুতে একবার মাসেহ করা সুন্নত। সর্বদা একবার মাসেহ করবে, একের অধিক মাসেহ করবে না। এটি ইবনে বায[৭] ও ইবনে উসাইমিন[৮] রহ. এর বক্তব্য।ইবনে উসাইমিন রহ. এর নিকট একের অধিক মাসেহ করা মাকরূহ।[৯]

দ্বিতীয় বক্তব্যঃ একাধিক বার মাসেহ করার বিষয়টি রাসূল স. থেকে প্রমাণিত। এটি আলবানী সাহেবের বক্তব্য।[১০]

মাসআলা-৪

গুপ্তাঙ্গ স্পর্শের দ্বারা ওযু ভঙ্গের বিধান

প্রথম বক্তব্যঃ সামনের কিংবা পিছের গুপ্তাঙ্গ সরাসরি স্পর্শের দ্বারা ওযু ভেঙ্গে যাবে। এক্ষেত্রে যৌন উত্তেজনা থাক বা না থাক। এটি ইবনে বায রহ. এর বক্তব্য।[১১]

---

[৭] মাজমুউ ফাতাওয়া ও মাকালাত, খ.২৯, পৃ.৫৯। ফাতাওয়া নুরুন আলাদ দারব, খ.২, পৃ.৬০৫।

[৮] মাজমুউ ফাতাওয়া ও রাসাইল, খ.১১, পৃ.১৫১। ফাতহু যিল যালালি ওয়াল ইকরাম, খ.১, পৃ.২৭১।

[৯] ফাতহু জিল যালালি ওয়াল ইকরাম, খ.১, পৃ.৬৪৯-৬৫০।

[১০] তামামুল মিন্না, পৃ.৯১।

[১১] মাজমুউ ফাতওয়া ও মাকালাত, খ.১০, পৃ.৩৩,৩৬,৯৯,১২৯। ফাতাওয়া নুরুন আলাদ দারব, খ.২, পৃ.৬১৯-৬২০ ।আল-ফাওয়াইদুল জালিয়্যা, পৃ.৪৩।

দ্বিতীয় বক্তব্যঃ যৌন উত্তেজনার সঙ্গে যদি গুপ্তাঙ্গ স্পর্শ করে, তবে ওযু নষ্ট হয়ে যায়। আর যদি যৌন উত্তেজনা ছাড়া স্পর্শ করে, তবে ওযু নষ্ট হবে না।এটি আলবানী সাহবের অভিমত।[১২]

তৃতীয় বক্তব্যঃ গুপ্তাঙ্গ স্পর্শের কারণে ওযু নষ্ট হবে না। তবে সতর্কতা হিসেবে ওযু করা উচিৎ।এটি ইবনে উসাইমিন রহ. এর বক্তব্য।[১৩]

মাসআলা-৫

জুমুয়ার দিনে গোসলের বিধান

প্রথম বক্তব্যঃ জুময়ার দিনে গোসল করা ওয়াজিব নয়, বরং সুন্নতে মুয়াক্কাদা। এটি ইবনে বায রহ. এর অভিমত।[১৪]

দ্বিতীয় বক্তব্যঃ জুময়ার দিনে গোসল করা ওয়াজিব। এটি আলবানী[১৫] ও ইবনে উসাইমিন[১৬] রহ. এর অভিমত।

মাসআলা-৬

নাপাক অবস্থায় কুরআন স্পর্শের বিধান

প্রথম বক্তব্যঃ ছোট নাপাকী কিংবা বড় নাপাকী, কোন অবস্থাতেই কুরআন স্পর্শ করা বৈধ নয়। অর্থাৎ ওযু ব্যতীত কুরআন স্পর্শ করা বৈধ নয়।

---

[১২] তামামুল মিন্না, ১০৩ ।আস সামারুল মুসতাতাব, খ.১, পৃ.২২।
[১৩] আশ-শরহুল মুমতা, খ.১, পৃ.৩২৫। মাজমুউ ফাতাওয়া ও রাসাইল, খ.১১, পৃ.২০৩।
[১৪] মাজমুউ ফাতাওয়া ও মাকালাত, খ.১০, পৃ.১৭১-১৭২। লিকাআতি মায়াশ শাইখানইন, খ.১, পৃ.১৪৪।
[১৫] তামামুল মিন্না, পৃ.১২০। সহীহু সুনানি আবি দাউদ, খ.২, পৃ.১৯২-১৯৩।
[১৬] আশ শরহুল মুমতা, খ.৫, পৃ.৮১-৮৩।

এটি ইবনে বায[১৭] রহ. ও ইবনে উসাইমিন রহ. এর অভিমত[১৮]

দ্বিতীয় বক্তব্য: ছোট নাপাকী হোক, কিংবা বড়, সর্বক্ষেত্রে কুরআন স্পর্শ করা বৈধ। এটি আলবানী সাহেবের বক্তব্য।[১৯]

মাসআলা-৭

মুক্তাদী কখন নামাযের জন্য দন্ডায়মান হবে

প্রথম বক্তব্য: মুক্তাদী যখন ইমামকে দেখবে তখন নামাযের জন্য দন্ডায়মান হবে। এটি সংখ্যাগরিষ্ঠ উলামায়ে কেরামের অভিমত।

দ্বিতীয় বক্তব্য: মুয়াজ্জিন যখন ক্বাদ কা মাতিস সালাহ বলবে তখন দন্ডায়মান হবে। এটি হাম্বলী মাযহাবের বিশুদ্ধ মত

তৃতীয় বক্তব্য: এ ব্যাপারে মুক্তাদী স্বাধীন। ইক্বামাতের শুরুতে, শেষে কিংবা মাঝে দন্ডায়মান হতে পারবে। এটি ইবনে বায ও ইবনে উসাইমিনের বক্তব্য।[২০]

---

[১৭] মাজমুউ ফাতাওয়া ও মাকালাত, খ.১০, পৃ.১৪৯। ফাতাওয়া নুরুন আলাদ দারব, খ.২, পৃ.৬৩৬।
[১৮] আশ শরহুল মুমতা, খ.১, পৃ.৩৬২। মাজমুউ ফাতাওয়া ও রাসাইল, খ.১১ পৃ.২১৩।
[১৯] তামামুল মিন্না, পৃ.১১৬। ফাতাওয়াশ শায়খ ফিল মাদীনাতি ওয়াল ইমারাত, পৃ.৬৮।
[২০] ফাতাওয়ায়ে ইবনে বায। খ.১০, পৃ.৩৬৭। শরহুল মুমাত্তা, ইবনে উসাইমিন। খ.৩, পৃ.৯।

মাসআলা-৮

ইক্বামাত দেয়া আরম্ভ হলে কিছু লোক যদি নফল নামায পড়তে থাকে, তবে নফল ছেড়ে দিবে না কি পুরা করবে?

প্রথম বক্তব্য: নামায ছেড়ে দিবে। তবে যদি শেষ রাকাতের রুকু শেষ করে থাকে তবে নামায পূর্ণ করবে। এটি ইবনে বায রহ. এর বক্তব্য।[২১]

দ্বিতীয় বক্তব্য: যদিও দ্বিতীয় রাকাতে থাকে, তবে হালকাভাবে আদায় করে নামায শেষ করবে। আর যদি প্রথম রাকাতে থাকে, তবে নামায ছেড়ে দিবে। এটি ইবনে উসাইমিন রহ. এর বক্তব্য।[২২]

মাসআলা-৯

সুতরার বিধান

প্রথম বক্তব্য: নামাযীর সামনে সুতরা ওয়াজিব। এটি নাসীরুদ্দিন আলবানী মরুহুমের বক্তব্য।[২৩]

দ্বিতীয় বক্তব্য: সুতরা সুন্নত। এটি ইবনে বায ও ইবনে উসাইমিনের বক্তব্য।[২৪] উল্লেখ্য এটি চার মাযহাব সহ সংখ্যাগরিষ্ঠ উলামায়ে কেরামের বক্তব্য।

---

[২১] ফাতাওয়ায়ে ইবনে বায, খ.১১, পৃ.৩৯২।
[২২] আশ শরহুল মুমাত্তা, খ.৪, পৃ.১৬৬।
[২৩] মুখতাসারু সিফাতিস সালাহ, পৃ.৮২।
[২৪] ফাতাওয়ায়ে ইবনে বায, খ.২৪, পৃ.২১। আশ শরহুল মুমাত্তা, ইবনে উসাইমিন। খ.৩, পৃ.২৭৭।

মাসআলা-১০

মসজিদে অঙ্কিত দাগগুলো কি সুতরার জন্য যথেষ্ঠ?

প্রথম বক্তব্য: জায়নামায বা মসজিদের ফ্লোরের কোন রেখা সুতরা হিসেবে যথেষ্ঠ নয়। সুতরার জন্য দন্ডায়মান কোন জিনিস হওয়া আবশ্যক ।এটি ইবনে বায রহ.এর মাযহাব ।[২৫]

দ্বিতীয় বক্তব্য: এগুলো সুতরা হিসেবে যথেষ্ঠ । এটি ইবনে উসাইমিনের বক্তব্য ।[২৬]

মাসআলা-১১

কোন কাতার উত্তম?

সাধারণভাবে প্রথম কাতার উত্তম । তবে ইমামের ডানে দাঁড়ানো উত্তম না কি বায়ে সে বিষয়ে ইবনে বায ও ইবনে উসাইমিন মতপার্থক্য করেছেন ।

প্রথম বক্তব্য: ডানের কাতার উত্তম। এটি ইবনে বায রহ. এর বক্তব্য ।[২৭]

[২৫] ফাতাওয়ায়ে ইবনে বায, খ.১১, পৃ.১০১ ।
[২৬] আশ শরহুল মুমতা । খ.৩, পৃ.২৮০ ।
[২৭] ফাতাওয়ায়ে ইবনে বায, খ.১২, পৃ.২০৫ ।

দ্বিতীয় বক্তব্য: যে দিকে দাঁড়ালে ইমামের সবচেয়ে নিকটবর্তী হবে সেদিকে দাঁড়াবে। উভয় দিকে সমান হলে ডান দিকে দাঁড়ানো উত্তম। এটি ইবনে উসাইমিন রহ. এর বক্তব্য।[২৮]

মাসআলা-১২

কাতারের পিছে একাকী নামায আদায়

অর্থাৎ কোন মুসল্লী যদি একা এক কাঁতারে দাঁড়ায়, তবে তার নামায বিশুদ্ধ হবে কি না, এ বিষয়ে সালাফী আলেমদের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে।

প্রথম বক্তব্য: নামায বিশুদ্ধ হবে না। এটি ইবনে বায ও অন্যান্য হাম্বলীদের মাযহাব। ইবনে বায রহ. এর মতে এক্ষেত্রে নামায পুনরায় আদায় করতে হবে।[২৯]

দ্বিতীয় বক্তব্য: কোন ওযরের কারণে একাকী দাঁড়ালে নামায বিশুদ্ধ হবে। নতুবা নামায বিশুদ্ধ হবে না। এটি ইবনে বায ও ইবনে তাইমিয়া রহ. এর অভিমত।[৩০]

মাসআলা-১৩

তাকবীর বলার বিধান

তাকবীর বলার সময় ঠোঁট ও জিহ্বা নাড়ানোর পাশাপাশি এতটুকু আওয়ায করতে হবে যেন মুসল্লী নিজে তাকবীরের আওয়াজ শ্রবণ করে। মুসল্লী

---

[২৮] আশ শরহুল মুমতা, খ.৩, পৃ.৯।
[২৯] ফতাওয়ায়ে ইবনে বায, খ.২৫, পৃ.১৫৯।
[৩০] আশ শরহুল মুমাত্তা, খ.৪, পৃ.২৭২।

এ পরিমাণ আওয়াজ করা জরুরি না কি শুধু ঠোঁট ও জিহ্বা নাড়ানো যথেষ্ট হবে, এ বিষয়ে সালাফী আলেমদের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে ।

প্রথম বক্তব্য: ঠোঁট ও জিহ্বা নাড়ানোর পাশাপাশি এ পরিমাণ আওয়াজ উঁচু করা আবশ্যক যেন নিজে তাকবীরের আওয়াজ শ্রবণ করে । এটি ইবনে বায রহ.এর অভিমত ।[৩১]

দ্বিতীয় বক্তব্য: শুধু ঠোঁট ও জিহ্বা নাড়ানো যথেষ্ট । আওয়াজ করে নিজে শোনা আবশ্যক নয় । এটি ইবনে উসাইমিন রহ. এর বক্তব্য ।[৩২]

মাসআলা-১৪

আউযু বিল্লাহ পড়ার বিধান

নামাযের শুরুতে আওযুবিল্লাহ কি প্রত্যেক রাকাতে পড়বে না কি শুধু প্রথম রাকাতে, এ বিষয়ে আরব আলেমদের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে ।

প্রথম বক্তব্য: কেউ যদি আউযুবিল্লাহ পড়ে তবে এতে কোন সমস্যা নেই । তবে আউযুবিল্লাহ শুধু প্রথম রাকাতে পড়া যাবে । অন্যান্য রাকাতে আউযুবিল্লাহ পড়ার অনুমতি নেই ।এটি ইবনে বায রহ. এর বক্তব্য ।[৩৩]

দ্বিতীয় বক্তব্য: প্রথম রাকাতে কেবল আউযবিল্লাহ পড়বে । কেউ যদি প্রথম রাকাতে পড়তে না পারে, যেমন রুকু অবস্থায় নামাযে শরীক হলো, তবে দ্বিতীয় রাকাতে আউযুবিল্লাহ পড়বে । কেউ যদি প্রত্যেক রাকাতে আউযুবিল্লাহ পড়তে চায়, তবে এর স্বাধীনতা রয়েছে ।[৩৪]

---

[৩১] ফাতাওয়া নুরুন আলাদ দারাব, ইবনে বায রহ. খ.৮, পৃ.২১৫ ।
[৩২] আশ শরহুল মুমাত্তা, খ.৩, পৃ.২১ ।
[৩৩] ফতাওয়ায়ে ইবনে বায, খ.২৯, পৃ.২৪৪ ।
[৩৪] আশ-শরহুল মুমাত্তা, খ.৩, পৃ.১৪১ ।

মাসআলা-১৫

উচ্চ আওয়াজ বিশিষ্ট নামাযে মুক্তাদীর জন্য ক্বেরাত পড়া লাগবে কি না?

প্রথম বক্তব্য: উচ্চ আওয়াজ বিশিষ্ট নামাযে মুক্তাদী সূরা ফাতেহা পড়বে না। এটি সংখ্যাগরিষ্ঠ উলামায়ে কেরাম, ইবনে তাইমিয়া ও নাসীরুদ্দিন আলবানী সাহেবের অভিমত।

দ্বিতীয় বক্তব্য: উচ্চ আওয়াজ বিশিষ্ট নামাযে মুক্তাদী সূরা ফাতেহা পাঠ করবে। এটি ইবনে বায ও ইবনে উসাইমিনের বক্তব্য।[৩৫]

মাসআলা-১৬

সূরা ফাতেহা পাঠের পর ইমাম কি বিলম্ব করবে?

সূরা ফাতেহা পাঠের পর অন্য ক্বিরাত পাঠের পূর্বে ইমাম বিলম্ব করবে কি না, এ বিষয়ে সালাফী আলেমদের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। তাদের বক্তব্যগুলো নিম্নরূপ:

প্রথম বক্তব্য: ইমাম সূরা ফাতেহা পাঠ করে বিলম্ব করবে। এবং সূরা ফাতেহা পাঠে যে পরিমাণ সময় লাগে, সে পরিমাণ বিলম্ব করবে।এটি ইবনে তাইমিয়া রহ. এর বিশিষ্ট ছাত্র ইবনুল কাইয়্যিম রহ.এর অভিমত।[৩৬]

---

[৩৫] ফতাওয়ায়ে ইবনে বায, খ.২৫, পৃ.১৪৩। আশ শরহুল মুমতি', খ.৩, পৃ.৩০৩।
[৩৬] যাদুল মা'য়াদ, খ.১, পৃ.২০১।

দ্বিতীয় বক্তব্য:সূরা ফাতেহা পাঠের পর বিলম্ব করবে না। এটি ইবনে বায রহ. এর অভিমত।[৩৭]

তৃতীয় বক্তব্য: সামান্য পরিমাণ বিলম্ব করবে যেন একবার শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে পারে। এটি ইবনে উসাইমিন রহ. এর অভিমত। সূরা ফাতেহা পরিমাণ বিলম্ব করা বিদআত।[৩৮]

মাসআলা-১৭

মুসল্লীর আমিন বলার বিধান

প্রথম বক্তব্য: ইমাম আমীন বললে মুসল্লীর জন্য আমিন বলা ওয়াজিব। এটি আলবানী সাহেবের বক্তব্য।[৩৯]

দ্বিতীয় বক্তব্য: ইমাম আমীন বললে মুক্তাদীর জন্য আমীন বলা সুন্নতে মুয়াক্কাদা। এটি ইবনে উসাইমিন রহ. এর বক্তব্য।[৪০]

---

[৩৭] ফাতাওয়ায়ে ইবনে বায, খ.১১, পৃ.৮৪।

[৩৮] আশ-শরহুল মুমতা, খ.৩, পৃ.৭২।

[৩৯] তামামুল মিন্না। পৃ.১৭৮। আসলু সিফাতিস সালাহ,খ.১, পৃ.৩৮২।

[৪০] মাজমুউ ফাতাওয়া ও রাসাইল, খ.১৩, পৃ.১১৫।

মাসআলা-১৮

শেষ দু'রাকাতে সূরা ফাতেহার পর অন্য ক্বিরাত পড়ার বিধান

প্রথম বক্তব্যঃ শুধু যোহরের নামাযের তৃতীয় ও চতুর্থ রাকাতে সূরা ফাতিহার পরে অন্য ক্বিরাত পড়া যাবে। এটি ইবনে বায রহ. এর বক্তব্য।[৪১]

দ্বিতীয় বক্তব্যঃ যে কোন নামাযের তৃতীয় ও চতুর্থ রাকাতে সূরা ফাতেহার পরে অন্য ক্বিরাত পড়ার অনুমতি রয়েছে। এটি ইবনে উসাইমিন রহ. এর অভিমত।[৪২]

মাসআলা-১৯

নফল নামাযে ইমাম ও মুক্তাদী উভয়ের জন্য তাসবীহের আয়াত আসলে তাসবীহ পড়া, প্রার্থনার আয়াত আসলে প্রার্থনা করা, আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনার আয়াত আসলে আশ্রয় প্রার্থনা করা সুন্নত। কিন্তু ফরজ নামাযে এর বিধান সম্পর্কে মতবিরোধ রয়েছে

প্রথম বক্তব্যঃ ফরজ নামাযেও এর অনুমতি রয়েছে। এটি ইবনে উসাইমিন এর বক্তব্য।[৪৩]

---

[৪১] ফাতাওয়ায়ে ইবনে বায, খ.১১, পৃ.৪৩।
[৪২] ফাতাওয়ায়ে ইবনে উসাইমিন, খ.১৩। পৃ.৩৮৬।
[৪৩] আশ শরহুল মুমতা, খ.৩, পৃ.২৮৯।

দ্বিতীয় বক্তব্য: ফরজ নামাযে এটি করা জায়েয নয়। এটি ইবনে বায রহ.এর বক্তব্য।[৪৪]

মাসআলা-২০

মুক্তাদী কি সামিআল্লাহ বলবে?

প্রথম বক্তব্য: মুক্তাদী সামিআল্লাহু লিমান হামিদা বলবে বরং মুক্তাদীর উপর সামিআল্লাহ বলা ওয়াজিব। এটি আলবানী সাহেবের অভিমত।[৪৫]

দ্বিতীয় বক্তব্য: সংখ্যাগরিষ্ঠ উলামায়ে কেরাম, ইবনে বায ও ইবনে উসাইমিনের বক্তব্য হলো, মুক্তাদী সামিআল্লাহ বলবে না।[৪৬]

মাসআলা-২১

রুকু থেকে উঠে বুকের উপর হাত বাঁধবে কি না

প্রথম বক্তব্য: বুকের হাত রাখবে না। বরং হাত ছেড়ে রাখবে। এটি আলবানী সাহেবের অভিমত। হাত বুকের উপর রাখাকে তিনি বেদয়াত ও ভ্রষ্টতা হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।[৪৭]

---

[৪৪] ফাতাওয়ায়ে ইবনে বায, খ.২৪, পৃ.৪০৪।
[৪৫] আসলু সিফাতিস সালাহ, খ.২, পৃ.৬৭৫।
[৪৬] ফাতাওয়ায়ে ইবনে বায, খ.১১, পৃ.৩০। আশ শরহুল মুমতা, খ.৩, পৃ.১০২।
[৪৭] আসলু সিফাতিস সালাহ, খ.২, পৃ.৭০০।

দ্বিতীয় বক্তব্য: রুকুর পূর্বে যেমন হাত বেঁধে রাখতো, তেমনি তেমনি হাত বুকের উপর রাখবে। এটি ইবনে বায ও ইবনে উসাইমিনের বক্তব্য।[৪৮]

মাসআলা-২২

সিজদায় যাওয়ার সময় আগে হাত রাখবে না কি হাঁটু রাখবে?

মুসল্লী সিজদায় যাওয়ার সময় আগে হাত রাখবে না কি আগে হাঁটু রাখবে, এ মাসআলায় সালাফী আলেমদের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে।

প্রথম বক্তব্য: আগে হাত রাখবে। অত:পর হাঁটু রাখবে। এটি আলবানী সাহেবের বক্তব্য।[৪৯]

দ্বিতীয় বক্তব্য: আগে হাঁটু রাখবে। অত:পর হাত রাখবে। এটি সংখ্যাগরিষ্ঠ উলামায়ে কেরামের অভিমত। এ মাসআলাটি গ্রহণ করেছেন, ইবনে বায ও ইবনে উসাইমিন।[৫০]

মাসআলা-২৩

দুই সিজদার মাঝের দুয়া পাঠের সময় আঙ্গুল উত্তোলন।

দুই সিজদার মাঝে দুয়া পড়ার সময় আঙ্গুল উত্তোলন করে ইশারা করবে কি না, এ বিষয়ে সালাফী আলেমদের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে।

---

[৪৮] ফাতাওয়ায়ে ইবনে বায, খ.১১, পৃ.৩০।

[৪৯]

[৫০] ফাতাওয়ায়ে ইবনে বায। খ.১১, পৃ.১৫৯। আশ শরহুল মুমতা, খ.৩, পৃ.১১০।

প্রথম বক্তব্য: আঙ্গুল উত্তোলন করে ইশারা করবে। এটি ইবনে তাইমিয়া রহ. এর ছাত্র ইবনুল কাইয়্যিম ও ইবনে উসাইমিনের অভিমত।[৫১] বিখ্যাত সালাফী আলেম ড. বকর আবু যায়েদের মতে ইবনুল কাইয়্যিম রহ. এর দিকে এ বক্তব্য সম্পৃক্ত করা একটি সুস্পষ্ট একটি ভুল। এটি ইবনুল কাইয়্যিম রহ. এর বক্তব্য নয়।[৫২]

দ্বিতীয় বক্তব্য: এসমস্ত ক্ষেত্রে হাত উত্তোলন করবে না। এটি ইবনে বাযের বক্তব্য।[৫৩]

মাসআলা-২৪

ইকআ এর বিধান

নামাযে ইকআ দুই প্রকার: যথা,

১. পায়ের গোড়ালী, পিন্ডলী কিংবা রান উঠিয়ে রেখে এবং উভয় হাত জমিনে রেখে উভয় নিতম্বের উপর বসা। সাধারণত কুকুর এমন বসে থাকে। একে ইকয়াউল কালব বলে। উলামায়ে কেরামের সর্ব সম্মতিক্রমে এধরণের বৈঠক মাকরুহ।
২. উভয় পা উঠিয়ে রেখে নিতম্বের উপর বসা। দ্বিতীয় এ পদ্ধতি সম্পর্কে সালাফী আলেমদের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে।
   প্রথম বক্তব্য: এটি সুন্নত। মাঝে মাঝে করা ভালো। এটি আলবানী ও ইবনে বায রহ. এর অভিমত[৫৪]

---

[৫১] আশ শরহুল মুমতা, খ.৩, পৃ.১২৯।
[৫২] লা জাদিদা ফি আহকামিস সালাহ, ড. বকর আবু যায়েদ। পৃ.৪০।
[৫৩] ফাতাওয়া ইবনে বায, খ.১১, পৃ.১১।
[৫৪] ফাতাওয়া নুরুন আলাদ দারব, খ.৯, পৃ.২৩৮।

দ্বিতীয় বক্তব্য: এটি রহিত। সুতরাং এখন এর উপর আমল করা হবে না। এটি ইবনে উসাইমিন রহ. বক্তব্য।[৫৫]

মাসআলা-২৫

ইস্তেরাহা বৈঠকের বিধান।

প্রথম বক্তব্য: ইস্তেরাহা বৈঠক সাধারণভাবে মুস্তাহাব। এটি ইবনে বায রহ. এর অভিমত।[৫৬]

দ্বিতীয় বক্তব্য: প্রয়োজন হলে মুস্তাহাব। এটি ইবনুল কাইয়্যিম রহ, ইবনে কুদামা রহ ও ইবনে উসাইমিন রহ. এর বক্তব্য।[৫৭]

মাসআলা-২৬

বৈঠক অথবা সিজদা থেকে উঠার সময় কিসের উপর ভর দিবে?

মুসল্লী সিজদা কিংবা বৈঠক থেকে উঠার সময় জমিনের উপর ভর দিয়ে উঠবে না কি হাঁটুর উপর? এ বিষয়ে সালাফী আলেমদের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে।

প্রথম বক্তব্য: জমিনের উপর ভর দিয়ে উঠবে। এটি আলবানী সাহেবের অভিমত।

---

[৫৫] আশ শরহুল মুমতা, খ.৩, পৃ.২২৯।
[৫৬] ফাতাওয়ায়ে ইবনে বায, খ.১১, পৃ.৯৯।
[৫৭] ফাতাওয়ায়ে ইবনে উসাইমিন, খ.১৩, পৃ.২১৮। আশ শরহুল মুমতা, খ.৩, পৃ.১৩৪।

দ্বিতীয় বক্তব্য: রানের উপর ভর দিয়ে উঠবে। এটি ইবনে বায ও ইবনে উসাইমিনের বক্তব্য।[৫৮]

মাসআলা-২৭

তাশাহুদের সময় আঙ্গুল উত্তোলন।

প্রথম বক্তব্য: শাহাদাত আঙ্গুল তাশাহুদের বৈঠকের শুরু থেকে উত্তোলন করে সালাম পর্যন্ত নাড়াতে থাকবে। এটি আলবানী সাহেবের অভিমত।[৫৯]

দ্বিতীয় বক্তব্য: তাশাহুদের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আঙ্গুল উত্তোলন করে রাখবে। দুয়া পাঠ যেমন দুরুদ শরীফ বা দুয়াযে মা'সুরা পড়ার সময় সামান্য আঙ্গুল নাড়াবে। এটি ইবনে বায রহ. এর অভিমত।[৬০]

তৃতীয় বক্তব্য: পূর্ণ বৈঠকের সময় আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করবে। তবে দুয়ার অবস্থা ব্যতীত আঙ্গুলগুলো সামান্য অবনমিত রাখবে। নিম্নোক্ত স্থানগুলোতে ইশারা করবে,

السلام عليك أيُّها النبيِّ,

السَّلامُ علينا

اللهم صَلِّ على محمَّد

اللهم بارك على محمَّد

---

[৫৮] ফাতাওয়া ইবনে বায, খ.১১, পৃ.১২। আশ শরহুল মুমতা, খ.৩, পৃ.১৩৪।
[৫৯] আসলু সিফাতি সালাতিন নাবী। খ.৩, পৃ.৮৫৪।
[৬০] ফাতাওয়া নুরুন আলাদ দারব, খ.৮, পৃ.৩৫৮।

أعوذ بالله من عذاب جهنَّم

ومِن عذاب القبر

ومِن فتنة المحيا والممات

ومِن فتنة المسيح الدَّجَّال

অর্থাৎ মোট আট স্থানে আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করবে ।[৬১]

মাসআলা-২৮

প্রথম বৈঠকে দুরুদ শরীফ পাঠ ।

প্রথম বক্তব্য: প্রথম বৈঠকে দুরুদ শরীফ পাঠ করা মুস্তাহাব । এটি ইবনে বায ও আলবানী সাহেবের অভিমত ।[৬২]

দ্বিতীয় বক্তব্য: প্রথম বৈঠকে দুরুদ শরীফ পাঠ করা মুস্তাহাব নয় । এটি ইবনে উসাইমিন রহ. এর বক্তব্য ।[৬৩]

---

[৬১] ফাতাওয়া ইবনে উসাইমিন, খ.১৩,পৃ.১৯৭ ।
[৬২] ফাতাওয়া ইবনে বায, খ.১১, পৃ.৪২ । আসলু সিফাতিস সালাহ, খ.৩, পৃ.৯০৪ ।
[৬৩] ফাতাওয়া ইবনে উসাইমিন । খ.১৩, পৃ.২২৭ ।

মাসআলা-২৯

মহিলাদের জন্য আযান ও ইকামত প্রদান

প্রথম বক্তব্য: মহিলাদের জন্য আযান ও ইকামত দেয়া বৈধ নয়। এটি ইবনে বায রহ. এর অভিমত।[৬৪]

দ্বিতীয় বক্তব্য: ঘরে নামায আদায় করার সময় মহিলা নিজে ইকামাত দিতে পারবে। এটি ইবনে উসাইমিনের বক্তব্য।[৬৫]

তৃতীয় বক্তব্য: পুরুষদের মতো মহিলারাও আযান ও ইকামাত দিতে পারবে। কেননা, নামাযের ক্ষেত্রে পুরুষ ও মহিলা সমান। এটি আলবানী সাহেবের বক্তব্য।[৬৬]

মাসআলা-৩০

রান ঢাকার বিধান

প্রথম বক্তব্য: রান সতরের অন্তর্ভূক্ত। সুতরাং সর্বদা এটি ঢেকে রাখার জরুরি। এটি ইবনে বায[৬৭] রহ. ও আলবানী সাহেবের অভিমত।[৬৮] আলবানী

---

[৬৪] মাজমুউ ফাতাওয়া, ইবনে বায রহ. খ.১০, পৃ.৩৫৬। ফাতাওয়া নুরুন আলাদ দারব, পৃ.৬৯৩,৬৯১,৬৮৯, ৮০০। আল-হুলালুল ইবরিযিয়্যা, খ.১, পৃ.১৯৮। লিকাআতি মায়াশ শাইখাইন, খ.১, পৃ.১৫৫।

[৬৫] আশ শরহুল মুমতা, খ.২, পৃ.৫১-৫২। লিকাআতি মায়াশ শাইখাইন, খ.২, পৃ.১৮৪।

[৬৬] তামামুল মিন্না, পৃ.১৪৪, ১৫৩, ১৫৫। সিলসিলাতুত যয়ীফা ওয়াল মাউযুয়া, খ.২, পৃ.২৭১। আল-হাবী মিন ফাতাওয়াশ শায়খ আলবানী, পৃ.১৮৪।

[৬৭] মাজমুউ ফাতাওয়া, খ.২৯, পৃ.২১৮। ফাতাওয়া নুরুন আলাদ দারব, খ.৪, পৃ.২০৮০।

[৬৮] তামামুল মিন্না, পৃ.১৫৯-১৬০। সিল-সিলাতুত আহাদীসিস সহীহা, খ.৪, পৃ.২৬০। হাদীস নং১৬৮৭। ইরইয়াউল গালিল, খ.১, পৃ.২৯৭-৩০২। তালখীসু আহকামিল জানাইয, পৃ.৩০।

সাহেব প্রথম দিকে রানকে সতরের অন্তর্ভূক্ত মনে করতেন না।[৬৯] কিন্তু পরবর্তীতে তিনি এ মত থেকে ফিরে আসেন এবং একে সতরের অন্তর্ভূক্ত মনে করেন।

দ্বিতীয় বক্তব্য: নামাযের সময় রান সতরের অন্তর্ভূক্ত। অন্যান্য সময় রান সতরের অন্তর্ভূক্ত নয়। এটি ইবনে উসাইমিন রহ. এর বক্তব্য।[৭০]

মাসআলা-৩১

কাঁধ আবৃত রাখার বিধান

প্রথম বক্তব্য: অনেকেই নামাযে কাঁধ অনাবৃত রেখে ফরজ নামায আদায় করে, বিশেষভাবে হজ্বের সময় ইহরাম বাঁধা অবস্থায়। এসম্পর্কে শায়খ ইবনে বাযকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, নামাযে উভয় কাঁধ আবৃত রাখা ওয়াজিব।[৭১] কাঁধ আবৃত করতে সক্ষম হলে মুসল্লীর জন্য কাঁধ আবৃত করা ওয়াজিব। এটি আলবানী সাহেবের বক্তব্য।[৭২]

দ্বিতীয় বক্তব্য: কাঁধ আবৃত রাখা সুন্নত, ওয়াজিব নয়।এটি ইবনে উসাইমিন রহ. এর বক্তব্য।[৭৩]

মাসআলা-৩২

প্রথম রাকাতে সূরা ফাতেহা পড়ার পূর্বে আউযুবিল্লাহ পড়ার বিধান

[৬৯] আস-সামারুল মুসতাতাব, খ.১, পৃ.২৫৪-২৭২।
[৭০] আশ শরহুল মুমতা, খ.২, পৃ.১৯৫। লিকাআতুল বাবিল মাফতুহ, খ.২ পৃ.১৪।
[৭১] মাজমুউ ফাতাওয়া ও মাকালাত, খ.১০, পৃ.৪১৫।
[৭২] তামামুল মিন্না,পৃ.১৬২-১৬৩।
[৭৩] আশ শরহুল মুমতা, খ.২, পৃ.২০০-২০১।

প্রথম বক্তব্য: প্রথম রাকাতে সূরা ফাতেহার পূর্বে আউযুবিল্লাহ পড়ার সুন্নত। এটি ইবনে বায[৭৪] ও ইবনে উসাইমিনের[৭৫] অভিমত।

দ্বিতীয় বক্তব্য: সূরা ফাতেহা পড়ার পূর্বে আউযুবিল্লাহ পড়া ওয়াজিব।এটি আলবানী সাহেবের অভিমত।[৭৬]

মাসআলা-৩৩

নামাযের যেসমস্ত স্থানে হাত উত্তোলন করা হবে।

প্রথম বক্তব্য: মুসল্লীর জন্য চার স্থানে রফয়ে ইয়াদাইন তথা হাত উত্তোলন সুন্নত। ১. তাকবীরে তাহরীমার সময়। ২. রুকুতে যাওয়ার সময়। ৩. রুকু থেকে উঠার সময়। ৪. দ্বিতীয় রাকাতে তাশাহুদ থেকে উঠার সময়। এটি ইবনে বায[৭৭] ও ইবনে উসাইমিনের[৭৮] বক্তব্য।

দ্বিতীয় বক্তব্য: নামাযে তাকবীরে তাহরীমা, রুকুতে যাওয়া ও রুকু থেকে উঠার সময় হাত উত্তোলনের পাশাপাশি কখনও অন্যান্য তাকবীরের সময়ও হাত উত্তোলন করা হবে।[৭৯]

---

[৭৪] মাজমুউ ফাতাওয়া ও মাকালাত, খ.২৯, পৃ.২৪৩-২৪৪। ফাতাওয়া নুরুন আলাদ দারব,খ.২, পৃ.৭৮২।
[৭৫] মাজমুউ ফাতাওয়া ও রাসাইল, খ.১৩, পৃ.১০৭,১১০। আশ শরহুল মুমতা,খ.৩, পৃ.৫৪, ৩৩০।
[৭৬] তালখীসু সিফাতিস সালাহ, ১৫।
[৭৭] মাজমুউ ফাতাওয়া ও মাকালাত, খ.১১, পৃ.১৫৬, খ.৩, পৃ.২৯২। ফাতাওয়া নুরুন আলাদ দারব, খ.২, পৃ.৭৮০, ৭৮১, ৭৮২।
[৭৮] মাজমুউ ফাতওয়া ও রসাইল, খ.১৩, পৃ.৮০-৮১। খ.১৩, পৃ.৬৩,৬৯,৩৭৭,৩৯৩।
[৭৯] তামামুল মিন্না, পৃ.১৭২-১৭৩। আসলু সিফাতিস সালাহ, খ.২, পৃ.৭১২-৭১৩। সিফাতু সালাতিন নাবী, পৃ.১৪০,১৫১,১৫৪,১৭৮। তালখীসু সিফাতি সালাতিন নবী, পৃ.২১,২৩,২৪,২৫,২৮।

মাসআলা-৩৪

তাশাহুদে আস-সালামু আলাইকা বলার বিধান

প্রথম বক্তব্য: মুসল্লী তাশাহুদে আস-সালামু আলাইকা আইয়্যুহান নাবিউ...পড়বে। এটি ইবনে উসাইমিন রহ. এর অভিমত।[৮০]

দ্বিতীয় বক্তব্য:তাশাহুদের আস-সালামু আলান নাবি পড়বে। এটি আলবানী সাহেবের অভিমত।[৮১]

মাসআলা-৩৫

তাহিয়্যাতুল মাসজিদের হুকুম

প্রথম বক্তব্য: তাহিয়্যাতুল মসজিদ সুন্নতে মুয়াক্কাদা। এটি ইবনে বায[৮২] ও ইবনে উসাইমিনের[৮৩] বক্তব্য।

দ্বিতীয় বক্তব্য:তাহিয়্যাতুল মসজিদ আদায় করা ওয়াজিব। এটি আলবানী সাহেবের অভিমত।[৮৪]

---

[৮০] আশ-শরহুল মুমতা, খ.৩, পৃ.১৫০-১৫১।
[৮১] সিফাতু সালাতিন নবী, পৃ.১৬১। আসলু সিফাতি সালাতিন নাবী স.খ.৩, পৃ.৮৮৩-৮৮৫।
[৮২] মাজমুউ ফাতাওয়া ও মাকালাত, খ.১১, পৃ.২৯৩। খ.১১, পৃ.৩৭৪। খ.৩০, পৃ.৬২।
[৮৩] আশ শরহুল মুমতা, খ.৫, পৃ.১০৫-১০৬। খ.৫, পৃ.১৫৩।
[৮৪] আস সামারুল মুসতাতাব, খ.২, পৃ.৬৩৭-৬৩৯।

মাসআলা-৩৬

সালাতুত তাসবীহ এর বিধান

প্রথম বক্তব্য: সালাতুত তাসবীহ শরীয়তে বিধি-বদ্ধ নয়। কেননা, এ সম্পর্কিত হাদীসগুলো শায ও যয়ীফ ।এটি ইবনে বায[৮৫] ও ইবনে উসাইমিনের বক্তব্য ।[৮৬]

দ্বিতীয় বক্তব্য: সালাতুত তাসবীহ শরীয়তে বিধি-বদ্ধ। এ সম্পর্কিত হাদীসগুলো সামগ্রিকভাবে সহীহ। এটি আলবানী সাহবের বক্তব্য ।[৮৭]

মাসআলা-৩৭

ফরজ ও নফলের মাঝে তারতম্যের বিধান

প্রথম বক্তব্য: ফরজ নামায শেষে কোন কথা বা মসজিদ থেকে বের হওয়ার মাধ্যমে ফরজ ও নফলের মাঝে পার্থক্য করা আবশ্যক। এটি ইবনে বায[৮৮] রহ. এর অভিমত। আলবানী[৮৯] সাহেবের মতে ফরজ নামায শেষে যে কোন ধরণের কথা বা স্থান ত্যাগ ব্যতীত সুন্নত পড়া বৈধ নয়।

দ্বিতীয় বক্তব্য: ফরজ ও সুন্নতের মাঝে কথা বা স্থান ত্যাগের মাধ্যমে পার্থক্য সৃষ্টি করা মুস্তাহাব। এটি ইবনে উসাইমিন রহ. এর বক্তব্য ।[৯০]

---

[৮৫] মাজমুউ ফাতাওয়া ও মাকালাত, খ.১১, পৃ.৪২৬।
[৮৬] মাজমুউ ফাতাওয়া ও রাসাইল, খ.১৪, পৃ.৩২৭। খ.১৪,পৃ.৩২৩-৩৩১।
[৮৭] আর-রাদ্দুল মুফহাম, পৃ.১০০। তা'লিকাতুশ শায়খ আলা মিশকাতিল মাসাবীহ, খ.১, পৃ.৪১৯।
[৮৮] মাজমুউ ফাতাওয়া ও মাকালাত, খ.১২, পৃ.৩৩৫-৩৩৬।
[৮৯] সিলসিলাতুল আহাদিসিস সহীহা,৭/১/৫২২-৫২৪। তা'লিকাতুশ শায়খ আলা রিয়াজিস সালিহীন, পৃ.৪১৯। হাদীস নং ১১৩৮।
[৯০] মাজমুউ ফাতাওয়া ও রাসাইল, খ.১৪, পৃ.২৯৬। আশ শরহুল মুমতা, খ.৪, পৃ.৩০৪-৩০৫।

মাসআলা-৩৮

তারাবীহের নামাযের রাকাত সংখ্যা

প্রথম বক্তব্যঃ রাসূল স. এর সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত রাকাতের অতিরিক্ত তারাবীহের নামায আদায়ের অনুমতি রয়েছে। এ ব্যাপারে মুসল্লী স্বাধীন। এটি ইবনে বায[৯১] ও ইবনে উসাইমিন[৯২] রহ. এর বক্তব্য।

দ্বিতীয় বক্তব্যঃ তারাবীহের নামায এগার রাকাতের অতিরিক্ত আদায় করা জায়েয নয়। এটি আলবানী সাহেবের বক্তব্য।[৯৩]

মাসআলা-৩৯

নামাযে মহিলার উভয় পা ঢাকার বিধান

প্রথম বক্তব্যঃ নামাযে উভয় পা ঢাকা আবশ্যক। এটি ইবনে বায[৯৪] ও আলবানী সাহেবের অভিমত।[৯৫]

---

[৯১] মাজমুউ ফাতাওয়া ও মাকালাত, খ.৩০, পৃ.২৩-২৪। ফাওয়াইদুন মিন দুরুসি সাম্মাহাতিশ শায়খ, পৃ.৩৪। আল-হুলালুল ইবরিযিয়্যা, খ.১, পৃ.২৯২।
[৯২] আশ-শরহুল মুমতা, খ.৪, পৃ.৫৩-৫৪। খ.৪, পৃ.৫১,৬১,৩৬০-৩৬১।
[৯৩] সালাতুত তারাবীহ, পৃ.২২-২৩, ৩৫,১০৬, ১০৮। তামামুল মিন্না, পৃ.২৫২-২৫৩।
[৯৪] মাজমুউ ফাতাওয়া ও মাকালাত, খ.২৯, পৃ.২২২। ফাতাওয়া নুরুন আলাদ দারব, খ.২, পৃ.৭৩৬। খ.৪, পৃ.২২১৭-২২১৮। লিকাআতি মায়াশ শাইখাইন, খ.১, পৃ১১০।
[৯৫] ফাতাওয়াশ শাইখ আলবানী ফিল মদীনাতি ওয়াল ইমারাত, পৃ.২৩৪-২৩৫। ফাতাওয়া মুহিম্মা লিনিসাইল উম্মা, পৃ.৯০-৯২। আল-ফাতাওয়াল উসতারালিয়া, পৃ.১২৫। আস-সামারুল মুসতাতাব, খ.১, পৃ৩১৯,৩২৪। সিল-সিলাতুল আহাদিসিস সহীহা, ১/২/৮২৮। হাদীস নং ৪৬০।

দ্বিতীয় বক্তব্য: উভয় পা ঢাকা আবশ্যক না হওয়াটা অধিক যুক্তিসঙ্গত। তবে আবশ্যক হওয়ার বিধানটিতে অধিক সতর্কতা রয়েছে।[৯৬]

মাসআলা-৪০

মসজিদে মেহরাব রাখার বিধান

প্রথম বক্তব্য: মসজিদে মেহরাব রাখা বেদয়াত নয়। এটি ইবনে বায রহ. এর বক্তব্য।[৯৭]

দ্বিতীয় বক্তব্য: মসজিদে মেহরাব রাখা মুবাহ। বরং এটি মুস্তাহাব হওয়া অধিক যুক্তিসঙ্গত।[৯৮]

তৃতীয় বক্তব্য: মসজিদে মেহরাব তৈরি করা বিদআত। এটি আলবানী সাহেবের বক্তব্য।[৯৯]

[৯৬] আশ শরহুল মুমতা, খ.২, পৃ.১৯২,২০২,২০৩। ফাতহু যিল-জালালি ওয়াল ইকরাম, খ.২, পৃ.২৬৭।
[৯৭] ফাতাওয়া নুরুন আলাদ দারব, খ.২, পৃ.৭১৬।
[৯৮] আশ শরহুল মুমতা, খ.২, পৃ.৩৩২,৩৩৩।
[৯৯] সিলসিলাতুত আহাদিসিস যয়ীফা, খ.১, পৃ.৬৪১-৬৪৭। হাদীস নং৪৪৮। আস-সামারুল মুসতাতাব, খ.১, পৃ.৪৭২-৪৭৮।